banglabook.com

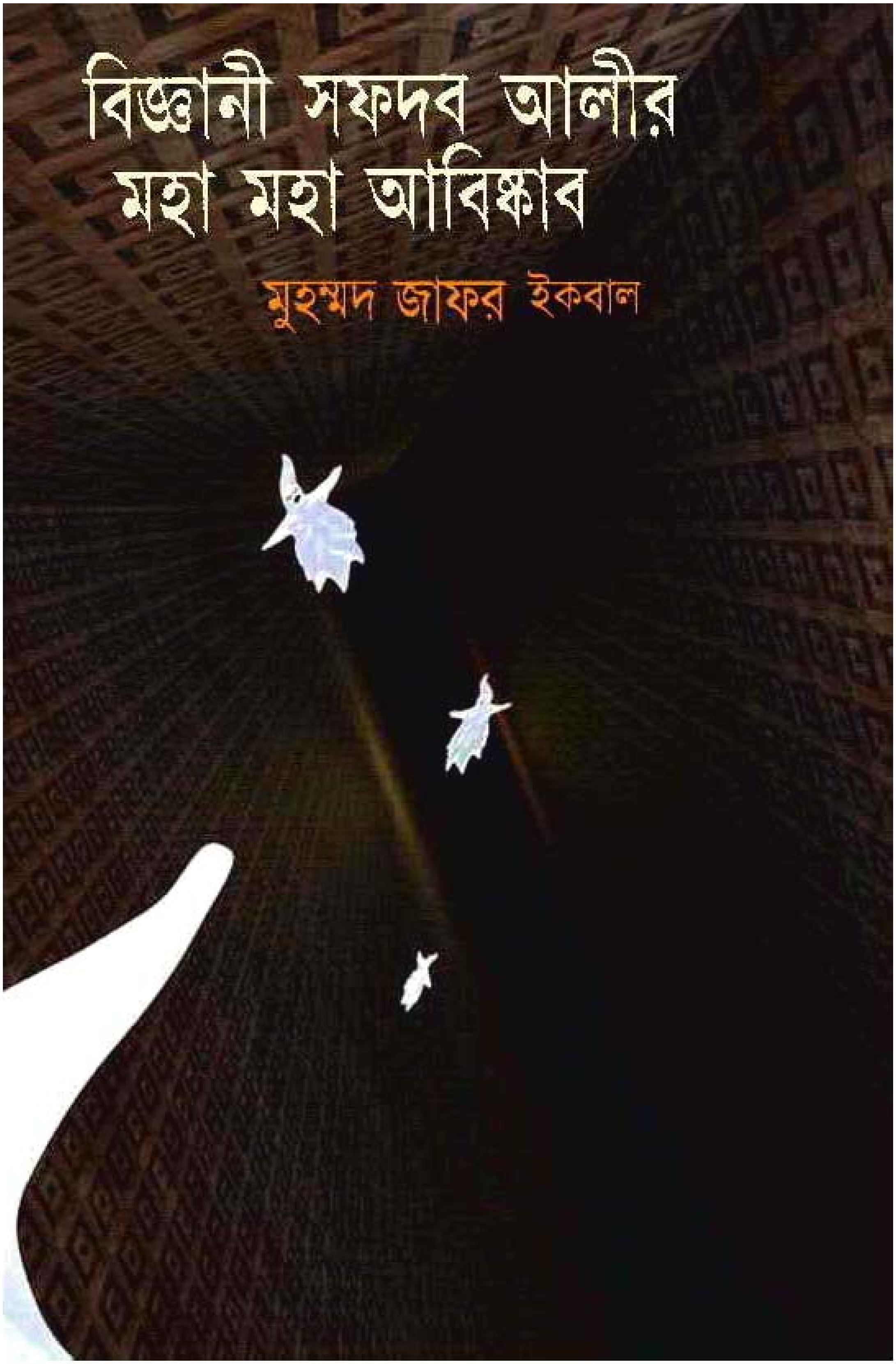

banglabook.com

কাচ্চি বিরিয়ানি

বিজ্ঞানী সফদর আলীর সাথে আমার পরিচয় জিলিপি খেতে গিয়ে। আমার জিলিপি খেতে খুব ভালো লাগে, গরম গরম মুচমুচে জিলিপি থেকে খেতে ভালো আর কী আছে? আমি তাই সময় পেলেই কাওরান বাজারের কাছে একটা দোকানে জিলিপি খেতে আসি। আজকাল আর কিছু বলতে হয় না, আমাকে দেখলেই দোকানি একগাল হেসে বলে, বসেন স্যার। আর দশ মিনিট। অর্থাৎ জিলিপি ভাজা শেষ হতে আর দশ মিনিট। দোকানের বাচ্চা ছেলেটা খবরের কাগজটা দিয়ে যায়, আমি বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি, খবরগুলো পড়ে বিজ্ঞাপনে চোখ বোলাতে বোলাতে জিলিপি এসে যায়। খেয়ে আমাকে বলতে হয় কেমন হয়েছে, ভালো না হলে নাকি পয়সা দিতে হবে না।

সেদিনও তেমনি বসেছি জিলিপি খেতে, প্লেটে গরম জিলিপি থেকে ধোঁয়া উঠছে, আমি সাবধানে একটা নিয়ে কামড় দেবার চেষ্টা করছি, এত গরম যে একটু অসাবধান হলেই জিভ পুড়ে যাবে! তখন আমার সামনে আরেকজন এসে বসলেন; ছোটখাটো শুকনা মতন চেহারা, মাথায় এলোমেলো চুল; মুখে বেমানান বড় বড় গোঁফ। চোখে ভারী চশমা দেখে কেমন যেন রাগী রাগী মনে হয়। শার্টের পকেটটি অনেক বড়, নানারকম জিনিসে সেটি ভর্তি, মনে হল সেখানে জ্যান্ত জিনিসও কিছু একটা আছে, কারণ কিছু একটা যেন সেখানে নড়াচড়া করছে! ভদ্রলোকটিও জিলিপি অর্ডার দিলেন, আমার মতন নিশ্চয়ই জিলিপি খেতে পছন্দ করেন। জিলিপি আসার সাথে সাথে তিনি পকেট থেকে টর্চ লাইটের মতো একটা জিনিস বের করলেন, সেটার সামনে কয়েকটি সুঁচালো কাঁটা বের হয়ে আছে। জিনিসটি দিয়ে তিনি একটা জিলিপি গেঁথে ফেলে কোথায় যেন একটা সুইচ টিপে দেন, সাথে সাথে ভিতরে একটা পাখা শোঁ শোঁ করে ঘুরতে থাকে, ভিতর থেকে জোর বাতাস বের হয়ে আসে। দশ সেকেন্ডে জিলিপি ঠাণ্ডা হয়ে আসে, সাথে সাথে তিনি জিলিপিটা মুখে পুরে দিয়ে তৃপ্তি করে চিবুতে থাকেন। আমি অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটি লক্ষ করছিলাম; আমার চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক একটু লাজুকভাবে হেসে বললেন, জিলিপি খেতে গিয়ে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

সত্যি তিনি সময় নষ্ট করলেন না, আমি দুটো জিলিপি খেয়ে শেষ করতে–করতে

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

banglabook.com

তাঁর পুরো প্লেট শেষ। সময় নিয়ে তাঁর সত্যি সমস্যা রয়েছে; কারণ হঠাৎ তাঁর শার্টের কোনো একটা পকেট থেকে একটা অ্যালার্ম বেজে ওঠে, সাথে সাথে তিনি লাফিয়ে উঠে পানি না খেয়েই প্রায় ছুটে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় পয়সা পর্যন্ত দিলেন না, হাত নেড়ে দোকানিকে কী একটা বলে গেলেন, দোকানিও মাথা নেড়ে খাতা বের করে কী একটা লিখে রাখল।

আমি বের হবার সময় দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কে। দোকানি নিজেও ভালো করে চেনে না, নাম সফদর আলী। মাসিক বন্দোবস্ত করা আছে, বৃহস্পতিবার করে নাকি জিলিপি খেতে আসেন। মাথায় টোকা দিয়ে দোকানি বলল, মাথায় একটু ছিট আছে।

ছিট জিনিসটা কী আমি জানি না। কিন্তু মাথায় সেটি থাকলে লোকগুলো একটু অন্যরকম হয়ে যায়; আর ঠিক এই ধরনের লোকই আমার খুব পছন্দ! কে এক সাধু নাকি দশ বছর থেকে হাত উপরে তুলে আছে শুনে আমি পকেটের পয়সা খরচ করে সীতাকুণ্ড গিয়েছিলাম। যখনই আমি খবর পাই কোনো পীর হাতের ছোঁয়ায় এক টাকার নোটকে এক শ' টাকা বানিয়ে ফেলছে, আমি সেটা নিজের চোখে দেখে আসার চেষ্টা করি। এত দিন হয়ে গেল এখনো একটা সত্যিকার পীরের দেখা পাই নি, সবাই ভণ্ড। আমার অবশ্যি তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, মজার মানুষ দেখা আমার উদ্দেশ্য, ভণ্ড পীরের মতো মজার মানুষ আর কে আছে? সফদর আলী যদিও পীর নন কিন্তু একটা মজার মানুষ তো বটেই! তাই সফদর আলীকে আবার দেখার জন্যে পরের বৃহস্পতিবার আমি আবার সেই দোকানে গিয়ে একই টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে থাকি।

ঠিকই সফদর আলী সময়মতো হাজির। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি, চশমার কাচের উপর গাড়ির ওয়াইপারের মতো ছোট ছোট দু'টি ওয়াইপার শাঁই শাঁই করে পানি পরিষ্কার করছে। দোকানের ভিতরে ঢুকে কোথায় কী একটা সুইচ টিপে দিতেই ওয়াইপার দু'টি থেমে গিয়ে উপরে আটকে গেল। সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে হেসে কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, বৃষ্টিতে চশমা ভিজে গেলে কিছু দেখা যায় না কিনা!

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কোথায় পেলেন এরকম চশমা?

পাব আর কোথায়, নিজে তৈরি করে নিয়েছি।

আমি তখনই প্রথম জানতে পারলাম, সফদর আলী আসলে এক জন শখের বিজ্ঞানী। কথা একটু কম বলেন, একটু লাজুক গোছের মানুষ, কিন্তু মজার মানুষ তো বটেই! আমি তাঁর কাপড়ের দিকে লক্ষ করে বললাম, একেবারে তো ভিজে গেছেন, ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

না, ঠাণ্ডা লাগবে না, বলে পকেটে আরেকটা কী সুইচ টিপে দিলেন। একটু পরেই তাঁর কাপড়-জামা থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যেতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে কাপড় একেবারে শুকনো খটখটে। সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী-একটা টিপে আবার সুইচ বন্ধ করে দিলেন। আমার বিস্মিত ভাবভঙ্গি দেখে আবার কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, কাপড়ের সুতার মাঝে মাঝে নাইক্রোম ঢুকিয়ে দিয়েছি, যখন

খুশি গরম করে নেয়া যায়। পকেটে ব্যাটারি আছে।

সফদর আলী আবার জিলিপি অর্ডার দিলেন। আজকেও টর্চ লাইটের মতো দেখতে সেই ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খুব তাড়াহুড়া নেই। আমি তাই আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম, প্রায়ই আসেন বুঝি এখানে?

না, শুধু বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার ছুটি কিনা!

কোনো অফিস বৃহস্পতিবার ছুটি হয় আমি জানতাম না, তাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী অফিস এটা যে বৃহস্পতিবারে আপনার ছুটি?

না না, আমার ছুটি নয়! বৃহস্পতিবার আমি ছুটি দিই।

কাদের ছুটি দেন?

এই, আমার একধরনের ছাত্রদের বলতে পারেন। সফদর আলী একটু আমতা আমতা করে থেমে গেলেন, ঠিক বলতে চাইছেন না, তাই আমি আর তাঁকে ঘাঁটালাম না।

সফদর আলী খুব মিশুক নন, তবে কথাবার্তা বলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সাথে কথা হল। অনেক কিছু জানেন আর মাথায় অনেক ধরনের পরিকল্পনা, তাই তাঁর কথা শুনতেই ভারি মজা! ব্যাঙের ছাতার চাষ করে কী ভাবে খাদ্য সমস্যা মেটানো যায় বা কেঁচো পুষে কী ভাবে ঘরের আবর্জনা দূর করা যায়, সে থেকে শুরু করে সংখ্যা কেন দশভিত্তিক না হয়ে ষোলভিত্তিক হওয়া দরকার—এধরনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ। সংখ্যা ষোলভিত্তিক হলে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করা নাকি খুব সহজ হবে, আজকাল সব মাইক্রোপ্রসেসর নাকি ষোল কিংবা বত্রিশ বিটের হয়, সেটার মানে কী, আমি জানি না। সফদর আলী বলেছেন, আমাকে আরেক দিন বুঝিয়ে দেবেন। তিনি নিজে সবসময়েই ষোলভিত্তিক সংখ্যায় হিসেব করেন, তাই তিনি গোনেন খুব অদ্ভুতভাবে। সাত, আট, নয়ের পর দশ না বলে বলেন কুরা। তারপর কিলি, চিংগা, পিরু, মিকা, ফিকার পরে নাকি আসে দশ! আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তিনি যখন দশ বলেন তার অর্থ নাকি ষোল! তিনি যখন বলেন এক শ', তার অর্থ নাকি দুই শ' ছাপ্পান্ন! ব্যাপারটি যে ফাজলামি নয় সেটা আমি জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের প্রফেসরের সাথে কথা বলে, সত্যি নাকি এ ধরনের সংখ্যা হওয়া সম্ভব!

পরের বৃহস্পতিবার আবার সফদর আলীর সাথে দেখা। তাঁকে একটু চিন্তিত দেখা গেল। গিনিপিগের লোমে তেল-হলুদ লেগে গেলে সেটা কী ভাবে পরিষ্কার করা যায় বা লোম পুড়ে গেলে পোড়া গন্ধটা দূর করা যায় কী ভাবে জানি কি-না জিজ্ঞেস করলেন। খুব সঙ্গত কারণেই আমি সেটা জানতাম না, গিনিপিগের লোমে তেল-হলুদ লাগতে পারে কী ভাবে কিংবা পুড়ে যেতে পারে কী ভাবে, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় এল না। তিনি কি শেষ পর্যন্ত গিনিপিগ রান্না করে খাওয়া শুরু করেছেন নাকি?

আজ কথাবার্তা খুব বেশি জমল না। কী যেন চিন্তা করে একটা কাগজে অনেকগুলো দাগ টেনে একটা দাগ আরেকটার সাথে জুড়ে দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন। আমি তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না, আমার নিজেরও কাজ ছিল, তাই উঠে পড়ার উদ্যোগ করতেই সফদর আলী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন?

banglabook.com

আমি? বিরিয়ানি? আমি মাথা নেড়ে জানালাম, রাঁধতে পারি না, শুধু খেতে পারি।

সফদর আলীর মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল দেখে বললাম, আমার বোন থাকে শান্তিনগরে, সে খুব ভালো কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধতে পারে।

সফদর আলী খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বোনকে বলবেন একটা কাগজে লিখে দিতে? বুঝলেন কিনা, করব যখন ভালো করেই করি!

কী করবেন?

সফদর আলী আমতা আমতা করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কবে দরকার আপনার বিরিয়ানির রেসিপি?

কাল দিতে পারবেন?

কোথায় দেব?

এইখানে।

আমার তাঁর বাসাটা দেখার ইচ্ছে, তাই বললাম, আপনার বাসাতে নিয়ে আসতে পারি, আমার কোনো অসুবিধে নেই।

সফদর আলী একটু ইতস্তত করে রাজি হলেন। একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন, শ্যামলীর কাছে কোথায় জানি থাকেন।

পরদিন আমি ঠিকানা খুঁজে সফদর আলীর বাসা বের করলাম। একটু নির্জন এলাকায় বেশ বড় একটা একতলা বাসা। দরজায় বেল টিপতেই ঘেউ-ঘেউ করে একটা কুকুর ভয়ানক রাগী গলায় চিৎকার করতে থাকে। কুকুরকে আমার খুব ভয় করে, আমি তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে আসি। সফদর আলী দরজা একটু ফাঁক করে নিজের মাথাটা বের করে জিজ্ঞেস করলেন, এনেছেন?

আমি ভেবেছিলাম আমাকে হয়তো ভিতরে বসতে বলবেন, কিন্তু তার সেরকম ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। বদরাগী কুকুরটার ডাক শুনে আমার নিজের ইচ্ছেও কমে এসেছে, তাঁর হাতে কাগজটা দিয়ে চলে এলাম। আসার আগে দরজার ফাঁক দিয়ে একটু উঁকি মারার চেষ্টা করে মনে হল মেঝেতে ইঁদুরের মতো অনেকগুলো কী যেন ঘোরাঘুরি করছে। গিনিপিগের কথা বলছিলেন, তাই হবে হয়তো।

পরের বৃহস্পতিবার সফদর আলীকে খুব খুশি খুশি দেখা গেল। নিজে থেকে আলাপ শুরু করলেন, বললেন, বুঝলেন ইকবাল সাহেব, আমার কাজ প্রায় শেষ। এখন লবণ একটু কম হয়, কিন্তু এমনিতে ফার্স্ট ক্লাস জিনিস!

কিসে লবণ কম হয়?

কেন, বিরিয়ানিতে! মনে নেই আপনি রেসিপি এনে দিলেন?

ও! আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিজেই রাঁধছেন বুঝি?

মাথা খারাপ আপনার, আমি রাঁধব? রান্না করা আমার দু'চোখের বিষ!

তাহলে কি ভালো বাবুর্চি পেয়েছেন নাকি?

সফদর আলী হা হা করে হাসলেন, বাবুর্চি বলতেও পারেন ইচ্ছা করলে। গিনিপিগ বাবুর্চি!

মানে?

banglabook.com

আমার রান্না করে দেয় গিনিপিগেরা।

আমি গরম চা খাচ্ছিলাম, বিষম খেয়ে তালু পুড়ে গেল। মুখ হাঁ করে খানিকক্ষণ বাতাস টেনে জিজ্ঞেস করলাম, কী বললেন! গিনিপিগেরা?

হুঁ! সফদর আলী চোখ নাচিয়ে বললেন, এত অবাক হচ্ছেন কেন, ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়, একটু সময় লাগে আর কী!

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সফদর আলী আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কিনা। এমনিতে অবশ্যি তিনি ঠাট্টা-তামাশার মানুষ নন, কিন্তু তাই বলে গিনিপিগ রান্না করছে সেটা বিশ্বাস করি কী ভাবে? সফদর আলী আমার অবিশ্বাসের দৃষ্টি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কম্পিউটারে অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান হয় কি-না?

আমি মাথা নাড়লাম, হয়।

কী ভাবে হয়?

আমি জানতাম না, তাই চুপ করে থাকলাম। সফদর আলী আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কম্পিউটার কখনোই একটা কঠিন সমস্যা একবারে করে না। সেটাকে আগে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে দেয়া হয়, তাকে বলে প্রোগ্রাম করা। প্রত্যেকটি ছোট ছোট অংশ আলাদা আলাদাভাবে খুব সহজ। কিন্তু সবগুলো একত্র হয়ে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়। রান্না করার ব্যাপারটাও তাই, পুরো রান্না ব্যাপারটা অনেক কঠিন, কিন্তু রান্না করাকে যদি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলা হয়, তা হলে সেই ছোট অংশগুলো কিন্তু মোটেও কঠিন নয়, যেমন একটা ডেকচি চুলোর উপরে রাখা বা ডেকচিতে খানিকটা ঘি ঢালা বা ঘি-এর মাঝে তেজপাতা ছেড়ে দেয়া—এই ছোট ছোট কাজগুলো যে কেউ করতে পারবে, একটু কষ্ট করে গিনিপিগকে শিখিয়ে দিলে একটা গিনিপিগও করতে পারবে।

সফদর আলী থামলেন। আর আমার মনে হল আমি খানিকটা বুঝতে পারছি তিনি কী ভাবে গিনিপিগকে দিয়ে রান্না করিয়ে নিচ্ছেন। আমার তখনো পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি, তাই সফদর আলী আবার শুরু করলেন, আমি করেছি কী, অনেকগুলো গিনিপিগকে নিয়ে তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা জিনিস করতে শিখিয়েছি। যেমন একটা গিনিপিগ একটা ডেকচি ঠেলে চুলোর ওপরে তুলে দেয়, সে আর কিছুই পারে না। যখনই একটা ঘন্টা বাজে তখনই সে ঠেলে ঠেলে একটা ডেকচি চুলোর উপরে তুলে দেয়। সেটা শেখানো এমন কিছু কঠিন না—দু'দিন এক ঘন্টা করে শেখাতেই শিখে গেল। এর পরের গিনিপিগটা শুধু চুলোটা জ্বালিয়ে দেয়, সেটা শেখানো একটু কঠিন হয়েছিল, প্রথম প্রথম লোম পুড়ে যেত, এখন সাবধান হয়ে গেছে, আর লোম পোড়ে না। চুলো ধরে যাবার পর তিন নম্বর গিনিপিগটা এসে ডেকচিতে খানিকটা ঘি ঢেলে দেয়, তার পরই তার ছুটি। এরকম সব মিলিয়ে চিচিংগাইশটা গিনিপিগ আছে—

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চিচিংগাইশ মানে কি?

ও, চিচিংগাইশ হচ্ছে দুই আর কিলি, তার মানে ষোল দু'গুণে বত্রিশ যোগ কিলি, তার মানে আপনাদের তেতাল্লিশ! যাই হোক এই তেতাল্লিশটা গিনিপিগ তেতাল্লিশটা ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট কাজ করে, সবগুলো যখন শেষ হয় তখন চমৎকার এক ডেকচি বিরিয়ানি রান্না হয়ে যায়। সফদর আলী কথা শেষ করে একটু হাসলেন।

banglabook.com

কিন্তু যদি গিনিপিগগুলো উল্টোপাল্টা করে ফেলে, ঘি গরম হবার আগেই যদি চাল ঢেলে দেয়?

করবে না, এক জন শেষ করার আগে আরেকজন শুরু করবে না। প্রথম গিনিপিগ তার কাজ শেষ করে দ্বিতীয়টার পেটে একটা খোঁচা দেয়, এই খোঁচা না খাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়টা তার কাজ শুরু করবে না। সব ট্রেনিং দেয়া আছে।

আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না। সফদর আলী যেটা বলেছেন, সেটা অসম্ভব হয়তো নয়, কিন্তু তাই বলে তেতাল্লিশটা গিনিপিগ হৈচৈ করে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমার অবিশ্বাসের ভঙ্গি দেখে সফদর আলী বললেন, আপনার বিশ্বাস হল না? আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে লেজ ধরে একটা নেংটি ইঁদুর বের করলেন, আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল সফদর আলী পকেটে করে জ্যান্ত কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! ইঁদুরটা টেবিলে রাখামাত্র পাশের টেবিলের এক জন চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, সে ভেবেছে খাবার থেকে ইঁদুর বেরিয়েছে। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করা হল, কিন্তু সফদর আলী আমাকে আর দেখাতে পারলেন না, ইঁদুরটা পকেটে ঢুকিয়ে বললেন পরদিন বিকালে তাঁর বাসায় যেতে। আমাকে গিনিপিগের বিরিয়ানি রান্না দেখাবেন।

পরদিন অফিসে গিয়ে শুনলাম জরুরি কাজে আমাকে তক্ষুনি চট্টগ্রাম যেতে হবে। আমাদের কোম্পানির এক জন ম্যানেজার নাকি অনেক টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আমাকে অফিস থেকে সোজা এয়ারপোর্ট যেতে হল, বাসায় এক জন খবর পৌঁছে দেবে। ভেবেছিলাম দু'তিন দিন লাগবে, কিন্তু সেই ম্যানেজার এমনই ঝামেলা করে রেখেছিল যে পুরো দুই সপ্তাহ লেগে গেল। ঢাকায় ফিরে এসে ভাবলাম, সফদর আলীর সাথে দেখা করি। কিন্তু অফিসে ছিলাম না বলে এত কাজ জমে গিয়েছিল যে সময় পেতে পেতে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সময় করে সফদর আলীর বাসায় গিয়ে তাঁকে পেলাম না। বেল টিপতেই কুকুরটা এমন ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল যে আমি আর অপেক্ষা করার সাহস পেলাম না। জিলিপির দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সফদর আলী অনেকদিন হল সেখানে আর যান না। পরে কয়েকবার তাঁর বাসায় গিয়েছি, তাঁর দরজায় চিঠি লিখে ঠিকানা দিয়ে এসেছি, কিন্তু তিনি আর যোগাযোগ করেন নি। আমাকে কয়েকদিনের ভেতরে আবার খুলনা যেতে হল, সেখানকার ম্যানেজারও নাকি কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। খুলনা থেকে গেলাম রাজশাহী, সেখান থেকে বগুড়া হয়ে ঢাকা। ঢাকায় ফিরে এসেও প্রথম-প্রথম অনেক ব্যস্ত ছিলাম, সপ্তাহখানেক পরে খানিকটা সময় পেয়ে ভাবলাম, সফদর আলীর বাসা থেকে ঘুরে আসি।

শ্যামলী আসার অনেক আগেই আমি বাতাসে বিরিয়ানির গন্ধ পেলাম। কাছাকাছি আসতেই মানুষের হৈচৈ শোনা যেতে লাগল। আরো কাছে গিয়ে দেখি সফদর আলীর বাসার চারপাশে অনেক লোকজন বসে বসে বিরিয়ানি খাচ্ছে, গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারলাম, আমার বোনের রেসিপি! লোকজন হাতে থালা-বাসন নিয়ে লাইন ধরে সফদর আলীর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না, এর

মাঝে দরজা একটু ফাঁক করে সফদর আলী বের হয়ে এলেন, হাতে এক ডেকচি গরম বিরিয়ানি। লোকজনকে বিরিয়ানি ভাগ করে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাকলাম। সফদর আলী ঘুরে আমাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, ছুটে এসে আমার হাত ধরে বললেন, ইকবাল সাহেব, তাড়াতাড়ি আসেন! আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে!

সফদর আলীকে চেনা যায় না, চুল উশকোখুশকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। আমি বললাম, কী হয়েছে আপনার?

ভেতরে আসেন, তাহলেই দেখবেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনার কুকুরটা বেঁধে রেখেছেন তো!

কুকুর? কিসের কুকুর?

সেই যে আপনার বাসায় বেল টিপতেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে!

ও! সফদর আলী দুর্বলভাবে হাসলেন, মানুষজনকে ভয় দেখানোর জন্যে কুকুরের ডাক টেপ করা আছে। বেল টিপতেই বেজে ওঠে! কুকুর পাব কোথায় আমি?

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল! আমি সফদর আলীর সাথে ভেতরে ঢুকলাম, ভেতরে বেশ অন্ধকার। খানিকক্ষণ লাগল অন্ধকারটা চোখে সয়ে যেতে, তারপর আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটি দেখতে পেলাম। ঘরের মাঝে সারি সারি গ্যাসের চুলা, তার মাঝে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, রান্না করছে শত-শত গিনিপিগ! গিনিপিগগুলো ছোটাছুটি করছে, কেউ *ঠেলে ঠেলে* ডেকচি নিয়ে যাচ্ছে, কেউ ঘি ঢালছে, কেউ পেঁয়াজ কাটছে, কেউ নেড়ে দিচ্ছে, কেউ চাল ঢেলে দিচ্ছে—সে এক এলাহি কাণ্ড! ঘর বিরিয়ানির গন্ধে ম' ম' করছে! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটি সামলে আমি কোনোমতে এক পাশে সরে এসে গিনিপিগদের দেখতে থাকি! সফদর আলী দুর্বল গলায় বললেন, মহা বিপদে পড়েছি।

কি বিপদ?

দেখছেন না! দিন-রাত গিনিপিগেরা শুধু বিরিয়ানি রান্না করে যাচ্ছে!

কেন? আপনি না বলেছিলেন তেতাল্লিশটা গিনিপিগ, এখানে তো মনে হয় তেতাল্লিশ শ'!

তেতাল্লিশটাই তো ছিল, কিন্তু মাঝে বাচ্চা হল সবার। আমার বাচ্চা বাড়ানোর ওষুধটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, তাতে অল্প সময়ে সবগুলোর নাতি-পুতি হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় চার শ' গিনিপিগ।

মোটে চার শ'? দেখে তো মনে হচ্ছে লাখখানেক।

আপনাদের হিসেবে প্রায় এক হাজার, আমার হিসেব ষোলভিত্তিক, তাই আমার এক শ' হয় দু'শ ছাপ্পান্নতে!

এই সবগুলোকে আপনি বসে-বসে রান্না শিখিয়েছেন?

মাথা খারাপ আপনার? বাচ্চাগুলো নিজে-নিজে মা-বাবাদের দেখে-দেখে শিখে গেছে। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, এখন সবাই রান্না করতে জানে, আর মুশকিল হচ্ছে এরা দিন-রাত শুধু রান্নাই করে যাচ্ছে, দিনে ত্রিশ-চল্লিশ বার রান্না হচ্ছে! কী ভাবে থামাই বুঝতে পারছি না।

কেন?

একবার ডেকচিগুলো কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম, সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করল। কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছি!

আমি গিনিপিগগুলো দেখেই বুঝতে পারলাম সমস্যাটি সহজ নয়, এতগুলো গিনিপিগকে থামানো কঠিন, সবাই যদি একটু করে খামচে দেয়, শরীরের চামড়া উঠে যাবে। আমার হঠাৎ মনে পড়ল সফদর আলী বলেছিলেন, তিনি প্রথমে একটা ঘন্টা বাজাতেন, তখন রান্না শুরু হয়ে যেত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সফদর সাহেব, আপনার সেই ঘন্টাটি কোথায়?

ঐ যে, তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। আশেপাশে কয়েকটা গিনিপিগ ঘোরাঘুরি করছে, মাঝে-মাঝে একটা এসে ঘন্টা বাজিয়ে দেয়, আর নতুন রান্না শুরু হয়ে যায়!

আপনি তো বলেছিলেন ঘন্টাটা আপনি নিজে বাজাতেন?

প্রথমে তাই বাজাতাম, আমাকে দেখে-দেখে এখন নিজেরাই শিখে নিয়েছে, যখন খুশি বাজিয়ে দেয়। ইলেকট্রিক ঘন্টা, বাজানোর খুব সুবিধে!

আমি সাবধানে ঘন্টাটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করতেই প্রায় ত্রিশটা গিনিপিগ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি লাফিয়ে কোনোমতে সরে এলাম!

সফদর আলী ছুটে এসে বললেন, সর্বনাশ! ওদের ঘাঁটাবেন না, মাংস শেষ হয়ে আসছে, আপনাকে কেটে বিরিয়ানির মাঝে দিয়ে দেবে!

আমি ঢোক গিলে বললাম, ঘন্টা বাজতেই যখন রান্না শুরু হয়, তখন ঘন্টা বাজানোটা বন্ধ করলেই তো সব বন্ধ হয়ে যায়। ঘন্টাটা কোনোমতে সরিয়ে ফেললেই হয়।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতে কিল দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন! কী বোকা আমি, একবারও এই সহজ জিনিসটা মনে হয় নি! ইলেকট্রিক ঘন্টা এটা, প্লাগ টেনে খুলে ফেললেই হবে, ঘন্টাটা সরাতেও হবে না! সফদর আলী ছুটে গিয়ে প্লাগটা টেনে খুলে ফেললেন!

সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে নতুন রান্না শুরু হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যেসব রান্না আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল গিনিপিগেরা সেগুলো শেষ করে গুটিগুটি নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। নিশ্চয়ই সেরকম ট্রেনিং দেয়া আছে। যে কয়টি গিনিপিগ ঘন্টা বাজানো শিখে নিয়ে এই দুর্গতির সৃষ্টি করেছে শুধু তারাই ঘোরাঘুরি করতে থাকে, একটু পরে পরে এসে ঘন্টা বাজানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্লাগ খুলে নেয়ায় আর শব্দ হয় না। একসময়ে সেগুলোও তাদের ঘরে ফিরে গেল, সফদর আলী দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখে হাসি নিয়ে ফিরে এলেন।

ছয় ডেকচি বিরিয়ানি রান্না হয়ে আছে। আমরা সেগুলো বাইরে বিতরণ করে দিয়ে এলাম। কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, কাল কখন আসবে। সফদর আলী যখন বললেন, আর আসতে হবে না—তারা বেশ অবাক হল। এক জন তো একটু রেগেই গেল মনে হল, সে নাকি দেশে চিঠি লিখে দিয়েছে, তার পরিবারের অন্য সবার আজ রাতে পৌঁছে যাবার কথা! সে এখন কী করবে সফদর আলীর কাছে জানতে চাইল, সফদর আলী কিছু বলতে পারলেন না! দরজায় তালা মেরে আমাকে নিয়ে একটা রিকশা নিলেন, অনেকদিন জিলিপি খাওয়া হয় না, আজ জিলিপি খাওয়া হবে।

banglabook.com

শেষ খবর অনুযায়ী সফদর আলী তাঁর এক হাজার গিনিপিগকে জমি চাষ করা শেখাচ্ছেন। তাঁর বাসার পিছনে খালি জায়গা আছে, সেখানে নাকি তারা আলু, ফুলকপি আর টমেটো লাগাচ্ছে! একটু বড় হলেই আমাকে দেবেন বলেছেন। আমি অপেক্ষা করে আছি। আজকাল সবজির যা দাম!

জংবাহাদুর

সদরঘাটে পুরানো লোহা-লক্কড়ের দোকানে সফদর আলীর সাথে আমার দেখা, মোটা লোহার হাতলের মতো দেখতে বিদঘুটে একটা জিনিস দরদাম করছিলেন। এরকম একটা জিনিস মানুষের কোনো কাজে লাগতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখতেই তিনি ভীষণ চমকে ঘুরে তাকালেন, আমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আপনি! আমি আরো ভাবলাম—

কী ভাবলেন?

সফদর আলী কথা শেষ না করে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, বললেন, নাহ্, কিছু না।

সফদর আলী তাঁর অভ্যাসমতো কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন দেখে আমি আর ঘাঁটালাম না। তাঁকে কেমন জানি একটু উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে, চেহারায় কেমন একটু উড়ো উড়ো ভাব, ভালো করে তাকিয়ে দেখি বাম হাতের বুড়ো আঙুলে একটা ব্যান্ডেজ। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আঙুলে কী হল?

আর বলবেন না, কিকুলমুকাসের স্ক্রু লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা মশা কামড় দিল ঘাড়ে, একটু নড়তেই ডালাটা খুলে এসে বুড়ো আঙুলটাকে থেঁতলে দিয়েছে।

কিকুলমুকাস কী জিনিস জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছিলাম, তার আগেই সফদর আলী আমাকে হাতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কুড়ি টাকা চাইছে, নিয়ে নেব নাকি, কী বলেন আপনি?

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, মাথা খারাপ আপনার? কুড়ি টাকা এই বিদঘুটে হাতলটার জন্যে? আমাকে তো কেউ বিনে পয়সায় দিলেও এটা নেব না! চলেন, চলেন এখান থেকে—আমি তাঁকে সেখানে থেকে টেনে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

দোকানি আমার কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ন হল বলে মনে হল; বলল, কী বলেন স্যার, খাঁটি আমেরিকান স্টিল, ডান্ডা মারলেও কিছু হবে না। ফাইটিং প্লেনের পার্টস, কেনা দামে দিয়ে দিচ্ছিলাম। নেন, না হয় আরো দুই টাকা কম দেবেন।

সফদর আলী চোখ ছোট করে গলা নামিয়ে দোকানিকে বললেন, ফাইটিং প্লেন কেউ কখনো লোহা দিয়ে বানায়? অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম আর টাংস্টেন, জিনিসটা হালকা করতে হবে না? সেন্টার অব গ্র্যাভিটি যদি ঠিক না থাকে জিনিসটার ব্যালেন্স হবে কী ভাবে?

দোকানি কিছু না বুঝে একটু অপ্রস্তুতের মতো হাসল। সফদর আলী আরো কী

banglabook.com

বলতে চাইছিলেন, আমি কোনোমতে তাঁকে টেনে সরিয়ে আনি। সদরঘাটের ভিড় বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সফদর আলী কী যেন চিন্তা করতে থাকেন, আমি তাঁকে বিরক্ত করলাম না। খানিকক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই, হঠাৎ একসময় ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষের ডিজাইনটা আসলে ঠিক হয় নি।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, কি বললেন?

মানুষের ডিজাইন, খুবই দায়সারা ডিজাইন।

মানে?

যেমন ধরেন এই হাতের ব্যাপারটা, মোটে দুইটা হাতে কি কিছু হয়? একটা মানুষের অন্তত চারটা হাত থাকা উচিত ছিল।

চারটা হাত?

হ্যাঁ। দুইটা হাতে কিছুই হয় না।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, চারটা হাতের কী দরকার? আমার তো দুইটা হাতেই বেশ চলে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় একবার নাটক করতে স্টেজে উঠেছিলাম— বিবেকের পার্ট, তখন দুই হাত নিয়েই কী মুশকিল, কোথায় নিয়ে লুকাই, কী করি! চার হাত হলে যে কী সর্বনাশ হত।

বাচ্চা ছেলেদের কথা শুনে বড়রা যেভাবে হাসে, সফদর আলী সেভাবে একটু হেসে বললেন, কী যে আপনি বলেন! কখনো সল্ডারিং করেছেন?

না।

করলে বুঝবেন। সল্ডার করার সময় এক হাতে জিনিসটা ধরতে হয়, আরেক হাতে সল্ডারিং আয়রন। ব্যস, দুই হাতই শেষ, সল্ডার ধরবেন কী দিয়ে? যদি চারটা হাত থাকত তা হলে তিন নম্বর হাত দিয়ে সল্ডার ধরা যেত।

কিন্তু আপনি তো চারটা হাতের কথা বলছেন।

হ্যাঁ, চার নম্বর হাত হচ্ছে চুলকানোর জন্যে। লক্ষ করে দেখেছেন, যখন কোনো কাজে দুই হাতই ব্যস্ত থাকে তখন সবসময় নাকের ডগা চুলকাতে থাকে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে ব্যাপারটি সত্যি এবং চুলকানোর জন্যে একটা বাড়তি হাত থাকা আসলে মন্দ ব্যবস্থা নয়।

সফদর আলী তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে বললেন, যদি আমার চারটা হাত থাকত, তাহলে আমি তিন নম্বর হাত দিয়ে কিকুলমুকাসের ডালাটা ধরে রাখতে পারতাম। যখন মশাটা এসে কামড় দিল তখন চার নম্বর হাত দিয়ে কষে দিতে পারতাম একটা থাবড়া।

সফদর আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মশার জন্যে, না চার নম্বর হাত নেই সেই দুঃখে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি চার হাতের একটা মানুষ কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হল না, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, বাকি দুটো হাত থাকবে কোথায় সফদর সাহেব?

কেন, বগল থেকে বেরিয়ে আসবে।

আমি কল্পনা করলাম আমার বগল থেকে আরো দুটো হাত বেরিয়ে আসছে, কিন্তু ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে।

banglabook.com

বাড়তি হাত দুটোতে যে পাঁচটা করে আঙুল থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই; সফদর আলী গম্ভীর হয়ে বললেন, দুটো করে থাকলেই হয়, নখ কাটতে তা হলে বেশি সময় নষ্ট হবে না।

যখন নিজেকে মোটামুটি বিশ্বাস করিয়ে এনেছি যে সত্যি মানুষের চারটা হাতের দরকার, তখন হঠাৎ আমার অন্য একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল, একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, কথাটা আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু—

দুই আঙুলের কথা তো, আমি—

না, আমি চার হাতের কথা বলছিলাম। আপনার কথা ঠিক, চার হাত হলে কাজকর্মে অনেক সুবিধে, কিন্তু চারটা হাতই যে একজন মানুষের হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

মানে?

আপনি খুঁজে পেতে একটা সহকারী নিয়ে নেন, তাহলেই আপনাদের দু'জনের মিলে চারটা হাত হয়ে যাবে।

ঠিক বলেছেন, সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ কী একটা মনে পড়ে যায় আর তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

সহকারী নেয়া যাবে না।

কেন?

সফদর আলী গলা এত নামিয়ে আনলেন যে কথা প্রায় শোনা যায় না, ফিসফিস করে বললেন, অনেক গোপন জিনিসের উপর গবেষণা করি তো, জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই যে কিকুলমুকাসের কথা বলছি, সেটা যদি কেউ জেনে ফেলে, কী সর্বনাশ হবে আপনি জানেন?

সফদর আলী এত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে থাকেন যে দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। এরপর আর কথাবার্তা জমল না, তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ছেন আমি পিছু-পিছু হাঁটছি—এরকম আর কতক্ষণ চলতে পারে? নবাবপুরের মোড়ে এসে আমি একটা বাস নিয়ে নিলাম, সফদর আলী যাত্রাবাড়ির দিকে রওনা দিলেন, সেখানে তাঁর নাকি কি দরকার।

দু' দিন পরের কথা। বিকেলে বাসায় এসে শুনি আমার নাকি একটা টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রামে জরুরি কিছু আছে ভেবে ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই মিলে সেটা খুলে ফেলেছে, কিন্তু পড়ে এখন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারার কথা নয়। কারণ টেলিগ্রামে লেখা :

চার হাতের প্রয়োজন নাই। দুই হাত এবং দুই হাত যথেষ্ট।
আপনি ঠিক। কিন্তু সহকারী নয়। সহজ সমাধান। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা সাতটা।

নিচে কোনো নাম লেখা নেই, কিন্তু বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না এটা কার কাজ। টেলিগ্রাম করতে তাঁকে বাসে কিংবা রিকশায় যত দূর যেতে হয়েছে, বাসার দূরত্ব তার

banglabook.com

অর্ধেকও নয়, কিন্তু তাঁকে সেটা কে বোঝাবে? বাসার সবাই জানতে চাইল ব্যাপারটা কি, আমি বোঝালাম আমার এক বন্ধুর রসিকতা। আমার বন্ধুদের সম্পর্কে বাসার সবার খুব উচ্চ ধারণা আছে সেরকম দাবি করব না, কাজেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে বেশি বেগ পেতে হল না।

সাতটার সময় কাওরান বাজারে চায়ের দোকানে হাজির হয়ে দেখি সফদর সাহেব টেবিলে একটা কাগজ বিছিয়ে সেখানে কী যেন একটা আঁকিজুকি করছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা ভাঁজ করে পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। আমি পাশে গিয়ে বসতেই গলা নামিয়ে বললেন, বানর, বানর হচ্ছে সমাধান!

কী বললেন?

বললাম বানর।

বানর? কিসের বানর?

কিসের আবার হবে, সফদর আলী একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, আমার একটা বানর দরকার।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বানর দিয়ে কী করবেন?

আপনি বলছিলেন না সহকারীর কথা? বানর হবে আমার সহকারী। আগে শুধু একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

বানরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন? আমি উচ্চস্বরে হাসতে গিয়ে থেমে গেলাম, আমার হঠাৎ গিনিপিগকে দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করার কথা মনে পড়ে গেল। সফদর আলী যদি গিনিপিগকে দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করিয়ে নিতে পারেন, কে জানে সত্যিই হয়তো বানরকে শিখিয়ে পড়িয়ে সহকারী বানিয়েও নিতে পারবেন। তবু ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না, একটু কেশে বললাম, বানরকে দিয়ে কী কী কাজ করানোর কথা ভাবছেন?

কঠিন কিছু নয়, সহজ কাজ। এই সকালে দু'টি রুটি টোস্ট করে এককাপ চা তৈরি করে দেবে, ঘরদোর একটু পরিষ্কার করবে, দুপুরে চিঠিপত্রগুলো আনবে—এইসব ছোটখাট কাজ।

আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, সফদর আলী বসে আছেন আর একটা বানর তাঁর জন্যে কড়া লিকারের চা তৈরি করছে!

আসল কাজ অবশ্যি আমার গবেষণা, সফদর আলী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, বানরকে দরকার সেজন্যে।

বানরের উপর গবেষণা?

না না, বানরের উপর আর নতুন কী গবেষণা হবে, সে তো প্রায় শেষ। আমি আমার নিজের গবেষণার কথা বলছি। বানর আমার গবেষণায় সাহায্য করবে, সে হবে আমার বাড়তি দুই হাত। মনে করেন কিকুলমুকাসটা খুলতে চাই, বলব, বান্দর আলী, স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এস তো—

বান্দর আলী?

সফদর আলী লাজুকভাবে হেসে বললেন, নামটা খারাপ হল?

না না, খারাপ হবে কেন, চমৎকার নাম! আমি হাসি গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম, পশুপাখিকে এভাবে কাজকর্ম শেখানো কি খুব কঠিন নাকি?

banglabook.com

সেটা নির্ভর করে কী ধরনের পশু তার উপর, সফদর আলী একটা লম্বা বক্তৃতা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন, যদি ম্যামেল বা স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়, তা হলে খুবই সহজ। ম্যামেলদের ভেতরে বানরের বুদ্ধি আবার অন্যদের থেকে বেশি, কাজেই বানরকে শেখানো একেবারে পানিভাত। পদ্ধতিটা হচ্ছে পুরস্কার পদ্ধতি, ট্রেনিং দেবার সময়ে যখনি একটা কাজ ঠিকভাবে করে তখনি পুরস্কার দিতে হয়। মনে করেন আপনি একটা বানর, আমি আপনাকে বললাম, বান্দর আলী, স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে এস তো। আপনি তখন আমার কথা কিছু না বুঝে লাফ-ঝাঁপ দেয়া শুরু করবেন। আমি তখন চেষ্টা করব আপনাকে স্ক্রু-ড্রাইভারের কাছে নিয়ে যেতে। লাফ-ঝাঁপ দিতে দিতে হঠাৎ যদি ভুলে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ছুঁয়ে ফেলেন, সাথে সাথে আপনাকে পুরস্কার হিসাবে একটা কলা দেব। এরকম কয়েকবার যদি করি তখন আস্তে আস্তে আপনি বুঝতে পারবেন স্ক্রু-ড্রাইভার কথাটা শুনে আপনি যদি স্ক্রু-ড্রাইভারটা গিয়ে ধরেন, তা হলে আপনি একটা কলা পাবেন। কলার লোভে এরপরে যখনই আমি বলব স্ক্রু-ড্রাইভার, আপনি ছুটে যাবেন স্ক্রু-ড্রাইভারটা ধরতে। এভাবে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ধরলেই আপনাকে একটা কলা দেব, কিন্তু পরে কলা পেতে হলে আপনাকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। বুঝতে পারলেন তো ব্যাপারটা?

হুঁ, তা বুঝেছি। নিজেকে একটা বানর ধরে নিলে বুঝতে ভারি সুবিধে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে শেখাতে অনেক দিন লেগে যাবে না?

না না, অনেক দিন লাগবে কেন, দু'সপ্তাহে হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার একটা মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ আছে, সেটা খাইয়ে দিলে তো কোনো কথাই নেই। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়।

কোন জায়গায়?

একটা বানর কোথায় পাই?

বানর পাচ্ছেন না?

নাহ্, অনেক খুঁজলাম কয়দিন ধরে, কোথাও বানর নেই। পুরানো ঢাকায় এক জন বলল, এক কাঁদি সাগর কলা আর একটা গরম সোয়েটার হলে সে নাকি ধরে দেবে। আমি তাকে এনে দিলাম, কিন্তু সেই থেকে তার আর দেখা নেই।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, সাগর কলা না হয় বুঝলাম, কিন্তু বানর ধরার জন্যে সোয়েটার কী জন্যে?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, কী জানি! জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা বলল, এখন শীত পড়ে গেছে, তাই বানরেরা নাকি সোয়েটারের জন্যে খুব ব্যস্ত। লোকটা বানর ধরতে গিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়ল কি না কে জানে! বানরেরা খুব দুষ্টু হয় জানেন তো, বিশেষ করে চ্যাংড়া বানরেরা। ঠিকানাও রাখি নি যে একটু খোঁজ নিই।

আমি আর কিছু বললাম না, বিজ্ঞানী মানুষেরা যদি বোকা না হয়, তাহলে বোকা কারা?

বানর কী ভাবে জোগাড় করা যায় সফদর আলী সেটা নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। বানরটা বেশি ছোট হলে অসুবিধে, কাজকর্ম করতে পারবে না।

বনজঙ্গল খুঁজে একটা ধাড়ি বানর ধরে আনতেও সফদর আলীর আপত্তি, তাহলে নাকি পোষ মানাতেই অনেক দিন লেগে যাবে। তার একটি পোষ মানানোর ওষুধ আছে, কিন্তু সেটা একটু কম–বেশি হয়ে গেলে পোষ মানার বদলে নাকি অল্প–অল্প দাড়ি গজিয়ে যায়! সফদর আলীর ইচ্ছা একটা পোষা বানর জোগাড় করা। আমি ভেবেচিন্তে তাকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বুদ্ধি দিলাম। একটু ইতস্তত করে সফদর আলী শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। নিজের ঠিকানা জানাতে চান না, তাই একটা পোস্ট অফিস বক্স খুলে নেয়ার কথা বললাম। বিজ্ঞাপনটা আমাকে লিখে দিতে বললেন, লেখালেখি তাঁর নাকি ভালো আসে না। কিন্তু আমি যেটাই লিখি তাঁর পছন্দ হয় না। ভাষাটা নাকি ঠিক জোরালো হচ্ছে না। ঘন্টাখানেক পরিশ্রম করে যেটা তাঁর পছন্দ হল সেটা এরকম :

সন্ধান চাই! সন্ধান চাই!! সন্ধান চাই!!!
পোষা বানরের সন্ধান চাই! উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইব!! যোগাযোগ করুন!!!

সফদর আলী বিজ্ঞাপন লেখা কাগজটি নিয়ে তখন–তখনি খবরের কাগজের অফিসের দিকে রওনা দিলেন, পরবর্তী এক সপ্তাহ সেটি ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপনটি ছাপা হবার সাথে সাথে সফদর আলী বানরের সন্ধান পেতে থাকবেন, আমার ঠিক সেরকম বিশ্বাস ছিল না। সপ্তাহ দুয়েক পার হবার পর হয়তো একটা–দুইটা চিঠি পাবেন, আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম, তাই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই আবার যখন টেলিগ্রাম এসে হাজির, আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। টেলিগ্রামটা পড়ে অবশ্যি অবাক থেকে বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠি, কারণ তাতে মাত্র দু'টি শব্দ লেখা :

বিজ্ঞাপন ব্যুমেরাং।

টেলিগ্রামের অর্থ না বোঝার কোনো কারণ নেই, সফদর আলী বলতে চাইছেন, বিজ্ঞাপনটি দেয়ার ফলে কোনো লাভ না হয়ে বরং উল্টো ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। সেটি ঠিক কী ভাবে হতে পারে আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না। সে রাতে আমার আবার এক জায়গায় খাবার দাওয়াত, বড়লোক আত্মীয়, তাদের টাকা পয়সার গল্পে ঠিক জুত করতে পারি না। তাই টেলিগ্রামের অজুহাত দেখিয়ে বাসার সবাইকে আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি কাওরান বাজারে সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম। আমার কপাল ভালো। সফদর আলী সেখানে বসে আছেন, তাঁকে দেখে চেনা যায় না। চোখের কোনে কালি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মনে হয় বয়স দশ বৎসর বেড়ে গিয়েছে! আমি ভয়ে–ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সফদর সাহেব, কী হয়েছে?

কী হয়েছে? আপনার বুদ্ধি শুনেই তো এখন আমার এই অবস্থা।

কী হয়েছে আগে বলবেন তো!

সফদর আলী কোনো কথা না বলে তাঁর বিরাট পকেট থেকে এক বান্ডিল চিঠি বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখেন।

আমি মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বললাম, বাহ্, অনেক চিঠি পেয়েছেন তো!

banglabook.com

সফদর আলী মেঘস্বরে বললেন, আগে পড়ে দেখেন।

আমি একটা পোস্ট কার্ড তুলে নিই। সেখানে গোটা গোটা হাতে একটা কবিতা লেখা :

সফদর আলী মিয়া
সদরঘাটে গিয়া
বান্দরের গেঞ্জি কেনে চাইর টাকা দিয়া।

আমি কোনোমতে হাসি চেপে রেখে পরের চিঠিটা খুলি। সেটি শুরু হয়েছে এভাবে :

জনাব,
আপনি বানরের সন্ধান চান? আমার মধ্যম পুত্র (বয়স এগার) এত পাজি যে তার স্বভাব আর বানরের স্বভাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আপনার আপত্তি না থাকিলে তাহাকে আপনার কাছে নিয়া আসিতে চাই ....

এর পরে মধ্যম পুত্রের বিভিন্ন কাজকর্মের নমুনা দেয়া আছে, পড়ে আমারো কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তার স্বভাবের সাথে বানরের স্বভাবের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমি আরেকটা চিঠি তুলে নিই, এটা ঝকঝকে কাগজে লেখা, উপরে একটা ফার্মের নাম আর টেলিফোন নাম্বার। টাইপ করা চিঠি। শুরু হয়েছে এভাবে :

জনাব সফদর আলী,
বানরের জন্য আপনি যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমরা পাইকারি বানর বিক্রেতা, দেশ ও বিদেশে আমরা বানরের চালান দিয়া থাকি। ব্যাবসার কারণে আমরা খুচরা বিক্রয় করিতে অসমর্থ। আপনি যদি দুই শতের অধিক বানর ক্রয় করিতে চান অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। আমাদের বানর সুস্থ সবল এবং মিষ্ট স্বভাববিশিষ্ট।......

এরপরে বানরের আকার–আকৃতি এবং স্বভাবের সুদীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমার হাসি গোপন করার চেষ্টা তাঁর চোখে পড়ে গেল। তিনি কেন জানি হঠাৎ আমার উপর রেগে উঠলেন, মুখ কালো করে বললেন, আপনার চিঠি পড়ে হাসি পাচ্ছে? ঠিক আছে, এইটা পড়ে দেখেন হাসি পায় কি না।

সফদর আলী চিঠির বান্ডিল থেকে একটা খাম বের করে দিলেন, ভেতরের চিঠিটা শুরু হয়েছে এভাবে :

শালা,
তোমাদের আমি চিনি। তোমরা আমাদের দেশের বানর বিদেশে পাঠাও তার উপর অত্যাচার করার জন্যে। ভেবেছ আমি তোমাকে খুঁজে পাব না? ঠিকই আমি

তোমাকে খুঁজে বের করব, তারপর কিলিয়ে তোমাকে আমি সিধে করব। তোমাদের মতো মানুষের চামড়া জ্যান্ত ছিলিয়ে সেই চামড়া দিয়ে জুতো বানানো দরকার।

আকরম খান

এই চিঠিটা পড়ে আমি সত্যিই একটু ঘাবড়ে যাই, ভরসার কথা, যারা সামনাসামনি কথা না বলে এরকম উড়ো চিঠি পাঠায়, ব্যক্তিগত জীবনে তারা আসলে কাপুরুষ হয়। বানরের ওপর অত্যাচারের যে কথাটা লিখেছে সেটা অবশ্যি পুরোপুরি অমূলক নয়, পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধের সময় শত্রুদেশের উপর ব্যবহার করার জন্যে যেসব বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি করা হয় সেগুলো বিভিন্ন পশুপাখি, বিশেষ করে বানরের উপর নাকি পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের নিরীহ সফদর আলীকে সেজন্যে দায়ী করার কী মানে থাকতে পারে?

আমি সফদর আলীকে সাহস দেয়ার জন্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করি। সফদর আলী সেটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে বললেন, মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো হয় কখনো? মানুষের চামড়ার কোনো ইলাস্টিসিটি আছে? আছে?

আমি তাড়াতাড়ি কিছু না বুঝেই বললাম, নেই, একেবারেই নেই। কোথেকে থাকবে?

তাহলে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল আকরম খাঁ মানুষের চামড়া দিয়ে জুতো বানানোর কথা বলে খুবই অবিবেচকের মতো কথা বলেছেন। সফদর আলী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বললেন, আমি এর মাঝে নেই, আপনি যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন।

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না, এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার। আজ থেকে আমি পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিগুলো আনব, খুলে পড়ে দেখব, যদি কোনো কাজের খবর থাকে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

সফদর আলী একটু শান্ত হলেন বলে মনে হল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একটা জিনিস যদি না টেকে সেটা বানিয়ে লাভ আছে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, কিসের কথা বলছেন?

জুতোর কথা। মানুষের চামড়া কত পাতলা, সেই জুতো কি এক সপ্তাহের বেশি টিকবে? ভিনিগারে এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রেখে, আল্টাভায়োলেট রে দিয়ে ঘন্টাখানেক যদি শুকানো যায়—

আমি চা খেতে গিয়ে বিষম খেলাম, এই নাহলে আর বিজ্ঞানী।

সফদর আলীর বানরের সন্ধান চেয়ে বিজ্ঞাপনের উত্তরে যেসব চিঠি এল সেগুলো পড়ে আমি মানুষের চরিত্রের একটা নতুন দিক আবিষ্কার করলাম, মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে শুধুমাত্র ঠাট্টা করার জন্যে চিঠি লিখতে ভারি পছন্দ করে। অসংখ্য চিঠিতে সফদর আলী এবং বানরকে নিয়ে কবিতা, কয়েকটি বেশ ভালো, ছন্দজ্ঞান প্রশংসা করার মতো। ঠিকানা দেয়া থাকলে আমি দেখা করে কবিতা লেখা চালিয়ে যাওয়ার

জন্যে উৎসাহ দিয়ে আসতাম। অনেকে চিঠিতে কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছেন, বানরকে দিয়ে কী করা হবে; অনেকে লিখেছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তারা বানর ধরে দেবে, কয়েকজন আবার আকরম খাঁর মতো ক্ষেপে বানরের ব্যবসা থেকে সরে পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। আমি যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ একটা চিঠি এসে হাজির। চিঠিতে শান্তিনগর থেকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, তাঁর একটি বানর আছে, বানরটিকে যত্ন করে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি বানরটি দিয়ে দিতে পারেন। চিঠি পড়ে আমার খুশি দেখে কে! সফদর আলীর সেই চেহারা অনেক দিন থেকে ভুলতে পারছি না। সবচেয়ে বড় কথা, চিঠিটা ঢাকা থেকে লেখা, ইচ্ছা করলে আমি এখনই গিয়ে খোঁজ নিতে পারি। আমি আর দেরি করলাম না, বাসায় কেউ একজন এসে সন্ধ্যাটা মাটি করার আগেই আমি বের হয়ে পড়লাম।

শান্তিনগরে ভদ্রলোকের বাসা খুঁজে বের করে শুনি তিনি নেই, ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসবেন। আমি সময় কাটানোর জন্যে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালাম। একটা চায়ের দোকানে এককাপ বিস্বাদ চা খেয়ে, একটা পানের দোকানে খানকয়েক আধুনিক গান শুনে, রাস্তার মোড়ে ঘাড় ব্যথা এবং মালিশের ওষুধের উপর একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনে ঘন্টাখানেক পরে আবার ভদ্রলোকের বাসায় এসে হাজির হই। এবারে ভদ্রলোক বাসায় আছেন, খবর পাঠাতেই বের হয়ে এলেন, মোটাসোটা হাসিখুশি চেহারা। আমি বললাম, আপনার সাথে একটু কাজ ছিল।

আমার সাথে? কাজ? ভদ্রলোক অবাক হবার ভান করে বললেন, আমি এত অকাজের মানুষ, আমার সাথে আবার কারো কাজ থাকতে পারে নাকি! তারপর চিৎকার করে ভেতরে বললেন, এই, চা দে বাইরে।

আমি পকেট থেকে সফদর আলীকে লেখা তাঁর চিঠিটা বের করে বললাম, আপনি এই চিঠিতে লিখেছিলেন—

ও! আপনিই সফদর আলী! ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি আরো অনেক মোটা হবেন, ভুঁড়ি থাকবে, মাথায় টাক থাকবে আর গায়ের রংটা একটু ফর্সা হবে! বুঝলেন কি না, মানুষের নাম শুনলেই আমার চোখের সামনে তার চেহারাটা ভেসে ওঠে।

আমি বললাম, আমি সফদর আলী না, সফদর আলী আরেকজন, আমি তাঁর হয়ে এসেছি।

ভদ্রলোকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আসল সফদর আলীর ভুঁড়ি আছে? মাথায় টাক?

ভদ্রলোককে নিরাশ করতে আমার একটু খারাপই লাগে, কিন্তু কী করব, বলতেই হয় সফদর আলীর ভুঁড়ি নেই, টাক নেই—বেমানান গোঁফ আছে, কিন্তু সেটা তো আর নাম শুনে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নি।

মানুষের নাম এবং চেহারার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। সুযোগ পেয়ে একসময় আমি বানরের কথাটা তুলে আনি। আমি খোলাখুলিভাবে বললাম বানরটার কেন প্রয়োজন, সফদর আলী তাকে কাজকর্ম শিখিয়ে সহকারী বানাবেন। আমি ভদ্রলোককে সফদর আলী সম্পর্কে বললাম, তিনি একজন শখের বিজ্ঞানী এবং লোকজনের ধারণা, তাঁর মাথায় ছিট আছে, আমার নিজেরও সে সম্পর্কে কোনো

banglabook.com

সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নেহায়েতই এক জন ভালোমানুষ। বানরটিকে তিনি নানারকম জিনিস শেখাবেন, কিন্তু কখনোই তিনি কোনোরকম কষ্ট দেবেন না। আমার ধারণা তিনি কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটি ভালো বোঝেন না।

ভদ্রলোক এককথায় বানরটি দিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন, আমি একটু কায়দা করে টাকার প্রসঙ্গটা তুলতেই ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন, বললেন, জংবাহাদুর আমার ছেলের মতো, আমি তাকে বিক্রি করতে পারি?

জংবাহাদুর?

হ্যাঁ, জংবাহাদুর আমার বানরটার নাম। কেউ তাকে যত্ন করে রাখলে এমনিই দিয়ে দেব, কিন্তু বিক্রি আমি করতে পারব না। মাঝেমধ্যে গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু টাকা আমি কী ভাবে নিই?

এবারে আমি উল্টো লজ্জা পেয়ে যাই। একটু থতমত খেয়ে বললাম, আপনার এত শখের বানর দিয়ে দিচ্ছেন কেন, রেখে দিন।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে তাহলে বলি, আগে কাউকে বলি নি। আমার একটা ছেলে আছে, এক বছর বয়স, জংবাহাদুরকে তার ভারি পছন্দ! আমি বাবা, আমার কাছে আসতে চায় না, দিনরাত্রি জংবাহাদুরের পিছনে ঘুরঘুর করে। যত দিন যাচ্ছে ততই আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বাবা হয়ে আমি সেটা কেমন করে সহজভাবে নিই? বুঝতেই পারেন জংবাহাদুর যেরকম খেলা দেখাতে পারে, আমি কি আর সেরকম খেলা দেখাতে পারি? ছেলের কী দোষ? সে আমাকে পছন্দ করবে কেন? এক বছরের ছেলে কি আর এত কিছু বোঝে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল বানরের সাথে খেলা দেখানো নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ভদ্রলোকের সাথে আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল, বেশ মানুষটি। আরো এককাপ সর-ভাসা চা খেয়ে উঠে পড়ার আগে বললাম, বানরটা কবে নিতে আসব?

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, এখনই নিয়ে যান।

এখনই? আমি?

হ্যাঁ, জংবাহাদুর খুবই ভদ্র, বিরক্ত করবে না। বয়স হয়েছে, বানরের হিসেবে রীতিমতো বুড়ো, খুব শান্ত। নিজের চোখেই দেখেন, বলে ভদ্রলোক চিৎকার করে ডাকলেন, জংবাহাদুর, এদিকে এস।

পর্দার ফাঁক দিয়ে একটা বানরের গম্ভীর মুখ দেখা গেল, আমাকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বানরটি আবার পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনাকে নতুন দেখেছে তো তাই কাপড় পাল্টে আসছে।

সত্যি তাই, একটু পরেই একটা লুঙ্গি পরতে-পরতে বানরটা বেরিয়ে এল, হেঁটে হেঁটে আমার সামনে এসে হাত তুলে আমাকে একটা সালাম করে গম্ভীর হয়ে একটা চেয়ারে বসে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার কি সালামের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

ভদ্রলোক বানরটিকে বললেন, জংবাহাদুর, তুমি, এখন এই ভদ্রলোকের সাথে যাবে, বুঝতে পেরেছ? বানরটি কী বুঝল জানি না, কিন্তু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল,

banglabook.com

যেন সত্যি বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোক আবার বললেন, যাও, শার্ট পরে এস, আর তোমার দড়িটি নিয়ে এস।

বানরটি সত্যিই ভদ্রলোকের কথা শুনে চেয়ার থেকে নেমে ভেতরে চলে গেল।

ভদ্রলোক একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন, হঠাৎ আমার তার জন্যে খুব কষ্ট হল, খুব শখের বানর, নিজেই বলেছেন একেবারে নাকি ছেলের মতো, দিয়ে দিতে নিশ্চয়ই তাঁর খুব খারাপ লাগছে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, দেখেন, আপনার যদি খুব খারাপ লাগে, থাকুক, আমরা অন্য একটা বানর জোগাড় করে নেব।

ভদ্রলোক বললেন, খারাপ তো লাগছেই, এত দিন থেকে আমার সাথে আছে, সে তো প্রায় ঘরের মানুষ, কিন্তু তবু আপনি নিয়েই যান। ছেলেটার শুধু যে জংবাহাদুরের সাথে খাতির তাই নয়, আজকাল তাকে দেখে দেখে বানরের মতো ব্যবহার করা শুরু করেছে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ছোট বাচ্চা যা–ই দেখে তা–ই শেখে, ওর আর দোষ কি? আর আপনি জংবাহাদুরকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, সফদর আলী তাকে অনেক যত্ন করে রাখবেন। আপনার যখন দেখার ইচ্ছা হবে গিয়ে দেখতে পারেন, ইচ্ছা হলে যখন খুশি বাসায় এনে যত দিন খুশি রাখতে পারেন।

ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খুব খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ভালো হয় তাহলে। মাঝে মাঝে বাসায় এনে কয়দিন রেখে ভালো করে খাইয়ে দেব, খুব খেতে পছন্দ করে বেচারা।

একটু পরেই জংবাহাদুর একটা শার্ট পরে হাজির হয়, তার মাথায় একটা হ্যাট, হাতে একটা টিনের বাক্স, ভেতরে নিশ্চয়ই তার স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি। তার গলায় দড়ি বাঁধা, দড়ির এক মাথা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে লম্বা একটা সালাম করল। ভদ্রলোক জংবাহাদুরকে তুলে খানিকক্ষণ বুকে চেপে ধরে রেখে নামিয়ে দিলেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেছে। আমি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেখানে আমার বাসার ঠিকানা, অফিসের টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলাম। ভদ্রলোককে বললাম, আমাকে ফোন করলেই আমি তাঁর সাথে জংবাহাদুরের দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব।

জংবাহাদুরকে নিয়ে বের হতেই এই এলাকার লোকজন তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, বোঝাই যাচ্ছে সে এই এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র। জংবাহাদুরও কাউকে সালাম কাউকে হ্যাট খুলে সম্ভাষণ আবার কাউকে দাঁত বের করে ভেংচি কেটে প্রত্যুত্তর দেয়। আমার একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। তাই প্রথম রিকশাটা পেয়ে দরদাম না করেই জংবাহাদুরকে নিয়ে উঠে পড়লাম। আমি আগে কখনো পশুপাখি নাড়াচাড়া করি নি, তাই একটু ভয় ভয় করছিল, বানরটা যদি হঠাৎ করে খামচে দেয়?

জংবাহাদুরকে নিয়ে রিকশা করে যাওয়াটা খুব উপভোগ্য ব্যাপার নয়। প্রথমে রিকশাওয়ালা জানতে চাইল আমি কত দিন থেকে বানরের খেলা দেখাই এবং এতে আমার কেমন উপার্জন হয়। আমি তাকে খুশি করার মতো উত্তর দিতে পারলাম না। রাস্তায় লোকজন, বিশেষ করে বাচ্চারা আমাকে "বানরওয়ালা" বলে ডাকতে থাকে।

রাজারবাগের মোড়ে রিকশার দিকে একটা পাকা কলা ছুটে এল। সময়মতো মাথা নিচু করায় কলাটা আমার মাথায় না লেগে রিকশার পিছন দিকে গিয়ে লাগল। আমি আমার জানা সমস্ত দোয়া-দরুদ পড়তে থাকি। আজ অক্ষত শরীরে শ্যামলীতে সফদর আলীর বাসায় পৌঁছুতে পারলে কাল দুই টাকা দান করে দেব বলে মানত করে ফেললাম।

ফার্মগেটের কাছে, যেখানে লোকজনের ভিড় সবচেয়ে বেশি এবং যেখানে লোকজন সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে আমাকে এবং জংবাহাদুরকে ডাকাডাকি করতে থাকে, সেখানে আমাদের রিকশার টায়ার ফেটে গেল। চার বছর আগে আরামবাগে এক জন ছোরা দেখিয়ে আমার মানিব্যাগে টাকা এত কম কেন সেটা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করার সময়েও আমি এত ভয় পাই নি। রিকশা থেমে যেতেই আমাদের ঘিরে একটা ছোট ভিড় জমে যায়। তার ভিতর থেকে এক জন দুর্ধর্ষ ধরনের বাচ্চা জংবাহাদুরের লুঙ্গির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা লেজ ধরে টানার চেষ্টা করতে থাকে। আমি রিকশার ভাড়া মিটিয়ে আরেকটা খালি রিকশা খুঁজতে থাকি, কিন্তু আমার সমস্ত পাপকর্মের প্রতিফল হিসেবে একটিও খালি রিকশা বা স্কুটার দেখা গেল না। আমি আরেকটা রিকশা না পাওয়া পর্যন্ত এই রিকশা থেকে নামতে চাইছিলাম না, কিন্তু এক জন পুলিশ এসে বলল, রাস্তায় বানরের খেলা দেখানো বেআইনি এবং আমি যদি একান্তই খেলা দেখাতে চাই তাহলে আমাকে রাস্তার পাশে খালি জায়গাটায় যেতে হবে। তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর আগেই সে আমাকে এবং আমাদের ঘিরে থাকা লোকজনকে ঠেলে-ঠেলে ফাঁকা জায়গাটিতে নিয়ে যায়। আমি কিছু বোঝার আগেই লোকজন আমাদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পুলিশটি সামনের লোকজনদের বসিয়ে দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক কোনায় দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তখন টপটপ করে ঘামছি, কোনোমতে ভাঙা গলায় বললাম, দেখেন, আমি বানরের খেলা দেখাই না, এটা আরেক জনের বানর—

লোকজনের উল্লাসধ্বনিতে আমার কথা চাপা পড়ে যায়, আমার কথায় এত আনন্দের কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না, তখন আমার জংবাহাদুরের দিকে চোখ পড়ে। সে তার টিনের বাক্স খুলে জিনিসপত্র বের করা শুরু করেছে, একটা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ম্যাচ দিয়ে সেটা জ্বালিয়ে দু'টি লম্বা টান দিয়ে সে খেলা শুরু করে দেয়। প্রথমে একটা ডুগডুগি বের করে বাজাতে থাকে, তারপর এক কোনা থেকে ছুটে এসে শূন্যে দু'টি ডিগবাজি খেয়ে নেয়। লোকজন যখন হাততালি দিতে ব্যস্ত, তখন সে যে ছেলেটি তার লেজ ধরে টানার চেষ্টা করেছিল তাকে খুঁজে বের করে তার কান ধরে মাঝখানে টেনে এনে গালে প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দেয়। লোকজনের উল্লাসধ্বনির মাঝে ছেলেটা প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। মুখ চুন করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে। এরপর জংবাহাদুরের আসল খেলা শুরু হয়, তার খেলা সত্যি দেখার মতো। বিভিন্ন রকম শারীরিক কসরত, মানুষের অনুকরণ, বিকট মুখভঙ্গি, উৎকট নাচ, কী নেই! শুধু তাই নয়, খেলার ফাঁকে ফাঁকে সে ক্রমাগত তার ডুগডুগি বাজিয়ে ভিড় আরো বাড়িয়েই যায়। আমি বোকার মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি আর প্রাণপণ দোয়া করতে থাকি পরিচিত কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে। খোদা আমার দোয়া শুনবে, আমার নিজের উপর সেরকম বিশ্বাস ছিল না, তাই যখন ভিড়ের মধ্যে আমাদের অফিসের বড় সাহেবকে আবিষ্কার করলাম,

তখন বেশি অবাক হলাম না। খেলা শেষ হতেই জংবাহাদুর তার টুপি খুলে পয়সা আদায় করা শুরু করে, আমি নিষেধ করার সুযোগ পেলাম না। লোকজন পয়সাকড়ি বেশ ভালোই দিল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি বড় সাহেব একটা আস্ত আধুলি দিয়ে দিলেন। জংবাহাদুর খুচরা পয়সাগুলো রুমালে বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। পরে গুনে দেখেছিলাম, মানতের দুই টাকা দেওয়ার পরেও দু'টি অচল সিকিসহ প্রায় সাড়ে তিন টাকা রয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সফদর আলীর বাসায় জংবাহাদুরকে পৌঁছে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আর যা-ই করি, কখনো বানর নিয়ে রাস্তায় বের হব না। বানরের খেলা দেখানো নিয়ে উত্তেজনা কমতে-কমতে প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে গেল। ফার্মগেটের মোড়ে সেদিন আমাকে কত মানুষ দেখছিল তার হিসেব নেই। সবাই বাসায় এসে সেটা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে গেছে। আমি ব্যাপারটি যতই বোঝানোর চেষ্টা করি, কেউ আর বুঝতে চায় না। আমার মা এখনো একটু পরে পরে বলেন, ছি ছি ছি, তোর নানা এত খান্দান বংশের লোক, আর তাঁর নাতি আজ রাস্তায় বানরের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়! অফিসের বড় সাহেবকে নিয়েও মুশকিল, একটু পরে-পরে সবার সামনে আমাকে প্রশংসা করে বলেন, আমার মতো স্বাধীনচেতা মানুষ তিনি নাকি জীবনে দেখেন নি। অফিসের বেতন যথেষ্ট নয় বলে বিকেলে আমার বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জনের সৎসাহস দেখে তিনি নাকি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে অনেক কষ্ট করেও ব্যাপারটি পুরোপুরি বোঝানো গেল না। বড় সাহেবদের মাথা একটু নিরেট হয়, কোনো কিছু একটা ঢুকে গেলে সেটা আর বের হতে চায় না।

সপ্তাহখানেক পর আমার সফদর আলীর সাথে দেখা, সফদর আলী হচ্ছেন এমন এক জন মানুষ যার মুখ দেখেই মনের কথা পরিষ্কার বলে দেয়া যায়। আজ যেরকম তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম, তাঁর কাজকর্ম ভালোই হচ্ছে, তিনি তাঁর বানরকে নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর চোখের কোনা একটু কুঁচকে আছে, যার অর্থ কোনো একটা কিছু নিয়ে তিনি একটু চিন্তিত। আমাকে দেখে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, হাসিমুখে বললেন, বানর স্ক্রু-ড্রাইভার ধরে কেমন করে জানেন?

আমি জানতাম না, তাই তিনি পকেট থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে দেখালেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে এত হাস্যকর যে তিনি কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারেন না। আমি চুপ করে বসে রইলাম, কারণ আমিও ঠিক ওভাবে স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করি। তাঁর হাসি একটু কমে এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বানরের ট্রেনিং কেমন হচ্ছে?

ভালো, বেশ ভালো। প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল।

কি অসুবিধে?

মনোযোগের অভাব, কিছুতেই জংবাহাদুরের মনোযোগ নেই, শুধু গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনার না একটা মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ আছে?

banglabook.com

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ আছে, কিন্তু সেটা খেতে এত খারাপ যে কিছুতেই জংবাহাদুরকে খাওয়াতে রাজি করাতে পারলাম না।

এখন মনোযোগ দিচ্ছে?

হ্যাঁ, এক সপ্তাহ পরে গত কাল প্রথম সে মনোযোগ দিয়েছে। হঠাৎ করে মনোযোগ দিল।

হঠাৎ করে?

হ্যাঁ, হঠাৎ করে। এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আবার হঠাৎ করে মনোযোগ ফিরে আসে।

বানরের মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। তাই এক সপ্তাহ অন্যমনস্ক থেকে হঠাৎ করে মনোযোগ দেয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। হয়তো নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে সময় নিয়েছে, হয়তো ভেবেছিল একটা সাময়িক ব্যাপার, আবার সে তার আগের বাসায় ফিরে যাবে। হয়তো তার মন খারাপ, বানরের মন খারাপ হতে পারে না এমন তো কেউ বলে নি—

গুলু গুলু গুলু গুলু—আমি হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত স্বরে বলছেন, গুলু গুলু গুলু গুলু।

থতমত খেয়ে বললাম, কী বললেন?

সফদর আলী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি বললাম?

আমি ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ, মানে আপনি কেমন একটা শব্দ করছিলেন না?

আমি? সফদর আলী আকাশ থেকে পড়লেন, আমি শব্দ করছিলাম?

হ্যাঁ।

কী রকম শব্দ?

আমি এদিকসেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে তাঁকে অনুকরণ করে বললাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

শুনে সফদর আলীর হাসি দেখে কে! পেট চেপে হাসতে হাসতে তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেল। কোনোমতে বললেন, আমি ওরকম শব্দ করেছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে রেস্টুরেন্টে লোকজনের মাঝে বসে বসে ওরকম শব্দ করব?

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। সত্যিই তো, এক জন বয়স্ক মানুষ হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কেন ওরকম একটা জিনিস বলবে? তা হলে কি আমি ভুল শুনেছি? কিন্তু সেটাও তো হতে পারে না, আমি স্পষ্ট শুনলাম তিনি বললেন—গুলু গুলু গুলু গুলু। আমি ব্যাপারটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না, সবাই জানে বিজ্ঞানীরা একটু খেয়ালি হয়, আর সফদর আলী তো এক ডিগ্রি উপরে।

সপ্তাহখানেক পরের কথা, রিকশা করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি রেসকোর্সের পাশ দিয়ে সফদর আলী হেঁটে যাচ্ছেন, আমি রিকশা থামিয়ে ডাকলাম, সফদর সাহেব।

সফদর আলী ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

বাসায়।

এখনি বাসায় গিয়ে কী করবেন? আসেন হাঁটি একটু। হাঁটলে পা থেকে রক্ত

banglabook.com

সঞ্চালন হয়, খুব ভালো কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়াম।

কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়ামের লোভে নয়, সফদর আলীর সাথে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার জন্যেই আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি। দু'জন রেসকোর্সের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, বছরের এই সময়টা এত চমৎকার যে বলার নয়। আমি সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, জংবাহাদুরের কী খবর? কাজকর্মে মনোযোগ দিয়েছে?

হ্যাঁ, দিচ্ছে, একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে এখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, আবার হঠাৎ করে মনোযোগ ফিরে আসে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। গত সপ্তাহে তাকে সল্ডারিং করা শিখিয়েছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, চমৎকার সল্ডারিং করে।

বাহ্!

এখন সার্কিট বোর্ড তৈরি করা শেখাচ্ছি। আল্ট্রা ভায়োলেট রে দিয়ে এক্সপোজ করে ফেরিক ক্লোরাইড নিয়ে "এচ" করতে হয়, ঠিকমতো না করলে বেশি না হয়ে কম হয়ে যায়, নানা ঝামেলা তখন।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, ও, আচ্ছা।

ফেরিক ক্লোরাইড জিনিসটা ভালো না, আরেকটা কিছু বের করা যায় কি না দেখতে হবে।

আমি এসব রাসায়নিক ব্যাপার কিছুই বুঝি না। আমার এক ভাগ্নে একদিন কথা নেই বার্তা নেই আমার ধোয়া শার্টে লাল রং ঢেলে দিল, আমি তো রেগে আগুন, কিন্তু কী আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে লাল রং উবে আবার ধবধবে সাদা শার্ট, লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই! আমি তো ভারি অবাক, আমার ভাগ্নে তখন বুঝিয়ে দিল, এটা নাকি কী একটা রাসায়নিক জিনিস, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রংটা উবে যায়। আমি তখন আমার ভাগ্নেকে বললাম, আমাকে এক বোতল বানিয়ে দিতে, অফিসে বড় সাহেবের গায়ে ঢেলে মজা দেখাব। আমার সেই ভাগ্নে প্রচণ্ড পাজি, একটা বোতলে খানিকটা লাল কালি ভরে দিয়ে দিল। আমি তো কিছু জানি না, অফিসে গিয়ে সবার সামনে বড় সাহেবের নতুন শার্টে সেই লাল রং ঢেলে দিলাম, এক মিনিট দুই মিনিট করে দশ মিনিট পার হয়ে গেল, রং উবে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই, বরং আরো পাকা হয়ে বসে গেল। সে কী কেলেঙ্কারি, চিন্তা করে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি চমকে উঠি, সফদর আলী আবার ওরকম শব্দ করছেন! আমি ভান করলাম যেন শুনি নি, চুপচাপ হাঁটতে থাকি। সফদর আলী আবার বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহজ স্বরে বললেন, একটা ব্যাপারে মানুষের চেয়ে বানরের সুবিধে আছে, সেটা হচ্ছে তার পা। মানুষ তার পা দিয়ে কিছু ধরতে পারে না, বানর পারে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আপনি একটু আগে ওরকম শব্দ করছিলেন

banglabook.com

কেন?

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, কী রকম শব্দ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

সফদর আলী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু এবারে কোনো ভুল নয়, আমি স্পষ্ট শুনেছি। আমি কী মনে করে সফদর আলীকে বেশি ঘাঁটালাম না, চিন্তিতভাবে হাঁটতে থাকি। আর্ট কলেজের সামনে এসে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, হঠাৎ শুনি সফদর আলী আবার অদ্ভুত গলার স্বরে বলছেন, মুচি মুচি মুচি মুচি—

আমি ভীষণ চমকে উঠলেও ভান করলাম যেন তাঁর কথা শুনতে পাই নি, সফদর আলী বলতেই থাকেন, মুচি মুচি মুচি মুচি।

আমি নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সহজ স্বরে বললেন, লেজ জিনিসটা আসলে খারাপ নয়। ওটা একটা বাড়তি হাতের মতো। মানুষের লেজ থাকলে মন্দ হত না!

আমি বললাম, আপনি জানেন, একটু আগে আপনি বলছিলেন, মুচি মুচি মুচি মুচি।

আমি?

হ্যাঁ, আপনি।

কী বলছিলাম?

মুচি মুচি মুচি মুচি।

সফদর আলী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ, আমি শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন?

আপনার অফিসের কাজকর্মের চাপ নিশ্চয়ই খুব বেড়েছে, সফদর আলী হাসি গোপন করার চেষ্টা করে বললেন, আপনার কয়দিন বিশ্রাম নেয়া দরকার। খুব চাপে থাকলে মানুষের বিভ্রম হয়, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা গুলিয়ে ফেলে। আপনি বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকেন।

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেলাম, এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। আমি এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে সফদর আলী নিজের অজান্তে এরকম অদ্ভুত শব্দ করেন। কিন্তু কেন? প্রত্যেক বার তিনি শব্দ করেছেন, যখন আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি তখন। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে আমি খানিকক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করলাম। আর সত্যি সত্যি তিনি অদ্ভুত শব্দ করা শুরু করলেন। প্রথমে বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। খানিকক্ষণ পরে বললেন, মুচি মুচি মুচি মুচি। আমি তবু অন্যমনস্ক হয়ে থাকার ভান করি। তখন হঠাৎ সফদর আলী ছোট ছোট লাফ দিয়ে হাততালি দিতে শুরু করলেন। ঠিক এই সময়ে এক জন সামনে দিয়ে আসছিল, রাস্তায় বয়স্ক এক জন মানুষ এভাবে লাফ দিচ্ছে দেখলে সে কী ভাববে? আমি তাড়াতাড়ি সফদর আলীর দিকে তাকাই। সাথে সাথে তিনি ভালোমানুষের মতো বললেন, বিবর্তনটা যদি একটু অন্যরকমভাবে হত, তাহলে হয়তো আজ মানুষের জায়গায় বানর পৃথিবীতে রাজত্ব করত, আর মানুষ গাছে গাছে